উনত্রিশ

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মফু ভাই ও শাহানা বুবুর বিয়ের ঠিক দুই মাস পর ১৮ই জুন কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন হাসপাতালে আবদুল মোমিন সাহেবের মৃত্যু হলো। হাওড়া স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে তিনি বড় রকম আঘাত পান, যদিও হাড়ভাঙ্গা ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর হয়নি। শারীরিকভাবে তিনি বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। বয়স হয়েছিল পুরো সত্তর বছর। এইভাবে পতনের আঘাতটা ছিল একটা trauma বা দৈহিক-মানসিকভাবে নাড়া খাওয়ার মতো ব্যাপার। এর ফলে তাঁর পেটে পানি জমে এবং অন্যান্য কারণে স্বাস্থ্যগত জটিলতা দেখা দেয়। অল্পদিন হাসপাতালে থাকার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ কলকাতা থেকে বর্ধমান এবং সেখান থেকে মাহাতা হয়ে আমাদের গ্রাম কাশিয়াড়ায় (কাসেমনগর) নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। যে মাইক্রোবাসটিতে তাঁর লাশ ছিল সেটিতে চড়েই আমি বর্ধমান থেকে কাসেমনগর যাই।

১৯৪৬ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে ভারতের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের কনভেনশনের পর ২৪শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। এর কিছুদিন পর আব্বা আমাদের গ্রাম কাসেমনগরে মুসলিম লীগের বামপন্থী নামে পরিচিত কর্মীদের এক সম্মেলন আহবান করেন। সেখানে বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীরা এসেছিলেন। আর এসেছিলেন তৎকালীন বাঙলার কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ। কমরুদ্দীন আহমদ,

শামসুল হক, ঢাকার শামসুদ্দীন আহমদ, নূরুদ্দীন আহমদ, নূরুল আলম, শেখ মুজিবুর রহমান, মহম্মদ তোয়াহা, খন্দকার মুশতাক আহমদসহ অনেকে দু'দিন সেখানে ছিলেন। কি সব আলোচনা এই সম্মেলনে হয়েছিল সেটা মনে নেই। সেসব শোনার কোন আগ্রহ বা ব্যবস্থাও বিশেষ ছিল না। তবে বেশ একটা হৈ চৈ এবং উৎসবের আবহাওয়া ছিল। আমাদের রং বাংলার বাড়ীতে নূরুল আলম, শরফুদ্দীন আহমদসহ আরও কয়েকজন ছিলেন বলে মনে পড়ে। অন্যেরা ছিলেন গ্রামের ভেতরে পুরাতন বিল্ডিংগুলির বাইরের দিকে সব কামরাতে এবং কুঠিবাড়ীতে।

এর কিছুদিন পরেই ঘটে ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য বৃটিশ লেবার কেবিনেটের সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স, লর্ড এ. ভি. আলেকজান্ডার ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ দিল্লী আসেন। অনেক সপ্তাহ ধরে কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ অন্য দলের নেতাদের সাথে আলোচনার পর ভারতকে A, B ও C এই তিন অঞ্চলে ভাগ করে একটি ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কেবিনেট মিশন এবং কংগ্রেস-লীগ নেতাদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ তাঁদের পাকিস্তান দাবী স্থগিত রাখেন। হঠাৎ তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরু এই চুক্তির বরখেলাপ করে বলেন যে, এর সব কিছু মানতে তাঁরা বাধ্য নন। বিশেষত পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব ও স্থিরকৃত ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পর্কে তিনি এ ধরনের মন্তব্য করায় জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদও পরে তাঁর India Wins Freedom নামক স্মৃতিচারণমূলক বইয়ে নেহরুর এই হঠকারী ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন।

জিন্নাহ, এই চুক্তিভঙ্গকে কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা প্রচেষ্টার অবসান বলে ঘোষণা করে বোম্বাই শহরে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এক জরুরী সম্মেলন আহবান করেন। ১৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য আর আলাপ-আলোচনা না করে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হবে। এই প্রস্তাবটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব (Direct Action Resolution) হিসেবে পরিচিত। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম বিক্ষোভের দিন ধার্য হয় ১৬ই আগস্ট। এই হিসেবে দিনটিকে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আব্বা তখন কলকাতায় থাকালেও আমরা ছিলাম বর্ধমানে। ১৬ই আগস্ট কলকাতা ময়দানে বিশাল জনসমাবেশ দেখার জন্য আব্বা আমাকে ও আমার ছোট ভাই শাহাবুদ্দীনকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐদিন যে বাঙলার ইতিহাসের সব থেকে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে সে বিষয়ে কারও ধারণা ছিল না। আমরা ছিলাম ৩৭ নং রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে।

আমাদের এলাকায় কোন হাঙ্গামা না থাকলেও ১৬ তারিখে সকাল ১০টার দিকে খবর পাওয়া গেল যে মানিকতলা, রাজাবাজার, ভবানীপুর ইত্যাদি এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এই এলাকাগুলি হিন্দু প্রধান। পরে মুসলমান প্রধান চীৎপুর, কলুটোলা

ইত্যাদিতেও গণ্ডগোলের ও দাঙ্গার কিছু খবর এলো। এই সব খবর সত্ত্বেও পার্ক সার্কাস, রিপন স্ট্রীট, আলিমুদ্দীন স্ট্রীট ইত্যাদি এলাকা তখন পর্যন্ত শান্তই ছিল।

ময়দানে জনসভার সময় ছিল বিকেল তিনটে বা চারটের দিকে। তার আগে থেকেই দলে দলে লোক মিছিল করে, পায়ে হেঁটে এবং গাড়ীতে ময়দানের দিকে যাওয়া শুরু করেছিল। আমরা দুই ভাই এবং অন্য দুই-একজন সঙ্গে কে ছিল মনে পড়ে না, আব্বার সাথে একটা গাড়ীতে প্রায় চারটের সময় ময়দানের কাছাকাছি পৌছালাম। সেখানে পৌছানোর কিছুটা আগে থেকেই পরিস্থিতি কেমন যেন অন্য রকম মনে হলো। তাছাড়া ময়দানের দিকে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে সকলকে নামতে হলো। চারিদিকে অস্বাভাবিক ভীড়ের জন্য গাড়ী সামনে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। আমরা নেমে পড়ে পায়ে হেঁটেই ময়দানে খুব উঁচু করে তৈরী মঞ্চের দিকে এগুতে থাকলাম। উঁচু হলেও মঞ্চটি বেশ বড় ছিল এবং তাতে ওঠার ব্যবস্থা ছিল পেছন দিকে তৈরী চওড়া মইয়ের মতো একটা সিঁড়ি দিয়ে। আব্বার তো দৃষ্টিশক্তির অসুবিধে ছিল তবু তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪১ বছর। তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন এবং নীচে অন্য কোথাও আমাদের দাঁড়াবার ব্যবস্থা না থাকায় আমরাও তাঁর পেছনে পেছনে উঠলাম মঞ্চে।

উপরে উঠে যে দৃশ্য দেখা গেল তা ভোলার নয়। জীবনের বেশী দিন তখন পর্যন্ত না দেখলেও সেই জীবনে এমন আর কিছু দেখিনি। চারিদিকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নেই, যাকে বলে একেবারে জনসমুদ্র। কিন্তু সেই জনসমুদ্র ছাড়াও তখন আর এক ব্যাপার ছিল। চারিদিকে ভীষণ উত্তেজনা। আওয়াজ উঠতে থাকলো মানিকতলা, ভবানীপুরে হিন্দুরা মুসলমানদেরকে মেরে শেষ করছে, জবাই করছে। একজনকে আমার মনে আছে। সে উত্তেজিত অবস্থায় একটা বন্দুক হাতে নিয়ে বলছিলো হিন্দু এলাকা থেকে এই বন্দুক পাওয়া গেছে, বদলার জন্য বন্দুক ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি। রিপন স্ট্রীট এলাকার শান্ত অবস্থার তুলনায় হঠাৎ করে এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমার অস্থির অবস্থা। আবার মঞ্চের পেছনে এই অবস্থা হলেও সামনে বিশাল জনারণ্য।

পরিস্থিতির এমন দ্রুত অবনতি হতে শুরু করলো যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশী ক্ষণ জনসভা চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত হলো। মোট চারজন বক্তৃতা করলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন, শহীদ সুহরাওয়ার্দী, রাজা গজনফর আলী খান এবং আব্বা। পাঞ্জাবের গজনফর আলী খান ছিলেন অতিথি বক্তা। নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা বেশ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। কিন্তু আব্বা নাজিমুদ্দীনের পর বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে ফোর্ট উইলিয়াম বা কলকাতার বৃটিশ কেল্লার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, হিন্দু মুসলমান সকলকে ঐ কেল্লা ভাঙতে হবে। সুহরাওয়ার্দীর বক্তৃতাও ঐ একই রকম ছিল। প্রত্যেকের বক্তৃতাই খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, কয়েক মিনিট করে। এইভাবে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে জনসভা ভঙ্গ হলো।

এরপর আমরা সোজা বাড়ীর পথে রওয়ানা হলাম। ময়দানের তখন এমন অবস্থা যে, চারিদিকে যানবাহন চলাচলের উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে জমায়েত

হয়েছিলো। তারা নানা রকম ধ্বনি, তার মধ্যে মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়ছিলো। আমরাও হাঁটতে শুরু করলাম। পুরো পথটা হেঁটে আমরা ফিরলাম রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে। ফেরার সময় সঙ্গে কারা ছিলেন এটা মনে নেই, তবে বেশ কয়েকজন ছিলেন।

জনসভায় যাওয়ার আগে রিপন স্ট্রীট এলাকায় যে শান্তভাব ছিল সেটা পরে আর সেই ভাবে থাকলো না। চারিদিকে বেশ উত্তেজনা। অন্ধকার হয়ে আসা সত্ত্বেও রাস্তার দিক থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। তার মধ্যে ছিল আল্লাহো আকবর ধ্বনি। নানা রকম গুজব আসতে শুরু হলো। মানিকতলা, রাজাবাজার, ভবানীপুর, শ্যামবাজার ইত্যাদি হিন্দু এলাকায় মুসলমানদেরকে খুন করা, তাদের বাড়ীঘর লুট করার খবর শুনে অনেকের মধ্যে বেশ উত্তেজনা দেখা গেল। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বাড়ীতে অন্য জায়গা থেকে কিছু লোকজন এসে গিয়েছিলেন। মুসলিম ছাত্র লীগের বেশ কয়েকজন কর্মীও ছিলেন। রিপন স্ট্রীট ছিল 'বেকার হোস্টেল' নামে মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেলের কাছে।

আমাদের বাড়ীটা ছিল রিপন স্ট্রীটের ভেতরের দিকে। বাড়ী থেকে একশো ফুটের মতো লম্বা দশ ফুট চওড়া একটা প্রাইভেট পথ রাস্তা পর্যন্ত ছিল। বছর দুই আগেও একবার রিপন স্ট্রীট দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার মাথা থেকে বাড়ীর গেট পর্যন্ত দেখলাম। সেই রকমই আছে। রাস্তা থেকে বাড়ী ভেতরে থাকা সত্ত্বেও অনেকে ভয় করলেন যে, রাত্রে হিন্দুরা আক্রমণ করতে পারে। রিপন স্ট্রীট, আলিমুদ্দীন স্ট্রীট ইত্যাদি মুসলমান প্রধান এলাকায় এসে হিন্দুদের পক্ষে আক্রমণ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সময়টা ছিল মহা উত্তেজনার। উত্তেজনার চিন্তা স্বাভাবিক হয় না।

যাই হোক, ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা অগ্রসর হতে থাকার সাথে সাথে কলকাতায় পুরোদস্তুর হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। হিন্দুদের সাথে থাকলো শিখরা। সেই রাত্রি থেকেই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি শুরু হলো। আমাদের বাড়ীটা ছিল একতলা। ছাদে ওঠার জন্য ছিল বাইরে থেকে লাগানো একটা কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে লোকজন উপরে ইট এবং ইটের টুকরো তুলে জড়ো করতে লাগলো। দুই-একটা ছুরি এবং লাঠিসোঁটারও ব্যবস্থা হলো। তখনকার দিনে লোকে বোমা, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদির কথা সহজে ভাবতেই পারতো না। কারণ সেগুলি সাধারণভাবে বাজারে বা অন্য কোথাও পাওয়া যেত না।

১৬ তারিখ রাত্রে অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুম এলো। ১৭ তারিখ সকালের দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেল। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে লোকজনের নানা রকম চীৎকার শোনা যেতে লাগলো। চীৎকারের অবস্থা দেখে মনে হলো মানুষ দৌড়াচ্ছে। রিপন স্ট্রীটে অনেকগুলি দোকান ছিল। রিপন স্ট্রীট একদিকে গিয়ে পড়ে লোয়ার সার্কুলার রোড (এখন আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোড) এবং অন্যদিকে ওয়েলেসলি স্ট্রীটে (এখন রফি আহমদ কিদওয়াই স্ট্রীট)। এই রাস্তাগুলিতেও অনেক দোকান ছিল।